International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-IV, January 2015, Page No. 8-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝি ও ইছামতী : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

ড. তপন রায়
Ex-Post Doctorate Fellow, ICSSR, New Delhi, India

Abstract

Padmanadir Majhi and Ichhamati are the most significant river centric novels in Bengali literature. The main subject matter of the both novels is the narrative of the society, life, life struggle and livelihood problems on the people of the banks of rivers. But both novels are not same type or same form. The first one is Regional novel and other is Epic novel. River is the important character of Padmanadir Majhi, but on the other hand in Ichhamati, there is no significant role of river. So there are some similarity and some differences in their form, plot, characters and styles. Therefore, to find out this truth, the comparative analysis of two novels is important.

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির অধিকাংশ গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে, যেমন সিন্ধু সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ইত্যাদি। এই সভ্যতাগুলি গড়ে ওঠার পেছনে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। শুধু তাই নয়, নদীকে কেন্দ্র করে মানব জীবনের বিচিত্র লীলা উদ্ভাসিত হয়েছে। এই নদী কখনো স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী, আবার কখনো রুদ্ররূপী, অনিষ্টকারী। নদীর এই সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার মধ্যে মানুষ যেমন তার ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটায়, আবার তেমনি অপার্থিব জীবনের শান্তি মেটাতে সক্ষম হয়। তবে শুধু সমাজ জীবনে নয়, সাহিত্যেও নদীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাংলা সাহিত্য তার একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যে নদীর কথা এসেছে একেবারে চর্যাপদের যুগ থেকে। পদকর্তা চাটিলপাদ ৫ নং চর্যাপদে ধর্মীয় তত্ত্বকথার মধ্যে অস্তিত্ব প্রবাহকে নদীর প্রবহের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন—"ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী"। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও নদীর প্রসঙ্গ আছে, যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটেছে নদীর পটভূমিকায়। তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের বাঁশী রাধাকে যমুনার তীরে টেনে এনেছে। আবার মনসামঙ্গলে বেহুলার গাঙুড়ের বুকে ভেলা ভাসিয়ে ইন্দ্রের সভায় যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে। তবে এগুলি কোনটাই পরিপূর্ণ নদী কেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টি নয়; এখানে নদী একটি গতিশীল প্রাণের আথবা কালপ্রবাহের প্রতীক মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ নদী কেন্দ্রিক সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা হল—প্রমথনাথ বিশীর 'পদ্মা' (১৯৩৫),মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬),তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' (১৯৪০) ও 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭),বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' (১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'(১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭) এবং দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত'(১৯৮৮) ইত্যাদি।এই সব উপন্যাসগুলিতে নদী পাড়ের মানুষের সমাজ ও জীবনের কথা বলা হলেও তার স্বরূপ এক নয়।এই কারণেই নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার আবশ্যিকতা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় হল নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝি-র সঙ্গে ইছামতী-র তুলনামূলক আলোচনা। এই ধরনের তুলনামূলক আলোচনার প্রবেশের পূর্বে তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে দু'চার কথা বলা দরকার। 'The Random House Dictionary of the English Language' গ্রন্থে তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—" The study of literatures of two or more national groups differing in cultural background and, usually , in language can centrating on their relationship to and influences upon each other."[১] অর্থাৎ সাহিত্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য হল দুই বা তার বেশি ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা সাহিত্য উপাদানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাদের আন্তঃসম্পর্ক এবং স্বতন্ত্রতা নির্ণয় করা।[২]

ইছামতী ও পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা: ইছামতী ও পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের নামের সঙ্গে বাংলার নদীর নাম যুক্ত থাকলেও আসলে দুটি উপন্যাস-ই হল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনি। এর মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-অপ্রেমের কথা আছে। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল পদ্মা পাড়ের ধীবরদের জীবন ও জীবিকার সংকটের কথা, তেমনি ইছামতী উপন্যাসে অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার নীল চাষীদের সংকটের কথা উল্লেখিত হয়েছে। পদ্মানদীর মাঝি'তে জীবন ও জীবিকার মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে, সেখানে ইছামতী'তে নীলকর সাহেব ও তাদের অধিনস্ত কর্মচারীদের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ এবং বাঁধাল নিয়ে প্রজাদের মধ্যে মারামারির চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই অন্নদাশঙ্কর রায় ইছামতী'কে আর একটা নীলদর্পণ বলে মন্তব্য করেছেন।

এই উপন্যাস দুটির সূচনা ও সমাপ্তিতে রয়েছে নদীর প্রসঙ্গ। পদ্মানদীর মাঝি যেভাবে শুরু হয়েছে তা হল—"বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে" এবং শেষ হচ্ছে—"ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। ….. কুবের নিরবে নৌকায় উঠিয়া গেল।….. সঙ্গে গেল কপিলা। হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারবে না"। ঠিক একই ভাবে ইছামতী উপন্যাসের শুরুতে এবং শেষে নদীর প্রসঙ্গ আছে, যেমন, শুরুতেই রয়েছে---"ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্তত যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু" এবং শেষ হচ্ছে -- "ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলেছে, গঙ্গাসাগর পারিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে"।

দুটি উপন্যাসেই আঞ্চলিক কথ্যভাষা ও লোকবিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা, লোক-উৎসব ইত্যাদি নানা লোক ঐতিহ্য পালনের প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন, পদ্মানদীর মাঝি'তে রথযাত্রা, দুর্গাপূজা ও দোল উৎসব উৎযাপনের প্রসঙ্গ আছে, তেমন ইছামতীতেও দুর্গাপূজা, তেরের পালুনি ইত্যাদি পালনের প্রসঙ্গ রয়েছে। অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাস-সংস্কার এই দুটি উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য স্মরণ যোগ্য। তিনি বলেছেন—"প্রবাহমান নদী ও রহস্যময় সমুদ্রের মধ্যে যাহাদের জীবন আতিবাহিত হয়, তাহাদের মনে প্রাকৃতিক বিপদ ও অতিপ্রাকৃত অনুভব যেন একই অভিজ্ঞতার ভিতর ও বাহির দিক বলিয়া প্রতিভাত হয়"।[৩]

উপন্যাস দুটিতে সমকালীন গ্রাম্য জীবনের নানান চিত্র ও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নানা রূপ ফুটে উঠেছে। যেমন, পদ্মানদীর মাঝি'তে বিবাহে কন্যাপণ **(Bride Price)** নেওয়ার রীতি কথা উল্লেখ আছে। কুবের তার মেয়ে গোপিকে বঙ্কুর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে পাঁচ কুড়ি টাকার পণ পেয়েছিল। তবে ইছামতী'তে বহুপত্নীমূলক কুলীন বিবাহ **(Polygyny)** প্রথার উল্লেখ আছে। রাজারাম তার তিন বোন তিলু, বিলু ও নিলু'কে ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিল। এছাড়া ইছামতী উপন্যাসে বর্ণভেদ প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়, তাই ব্রাহ্মণদের অনেকেই নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নালু পালের বাড়িতে ভোজ খেতে যায়নি।

পদ্মানদীর মাঝি ও ইছামতী দুটি উপন্যাস নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এই দুটি উপন্যাস কিন্তু একই টাইপ বা প্রকৃতির নয়। পদ্মানদীর মাঝি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস হলেও তা সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। তবে আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সত্তার বিশিষ্ট প্রকাশ ও পূর্ববঙ্গের ভাষার কৃত্রিমহীন সংযত ব্যবহারে লেখক একটি বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।[৪] অন্যদিকে ইছামতী একটি মহকাব্যিক উপন্যাস। শুধু বিশালতার দিক থেকে নয়, বিভূতিভূষণের তিনটি মূখ্য সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য এখানে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, ইতিহাস তথা সমাজ,প্রকৃতি ও মহাকাল।[৫] এখানে উপন্যাসের আনেক চরিত্র ও কাহিনি কালের গহ্বরে হারিয়ে গেলেও তা মহাকাব্যের সংবাদ বহন করে নিয়ে গেছে। এখানেই মহাকাব্যিক উপন্যাসের সার্থকতা।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে 'পদ্মা নদী' একটি মুখ্য চরিত্র রূপে অঙ্কিত হলেও ইছামতী'তে তেমনটি হয়নি। কারণ পদ্মার বিভিন্ন রূপ এই উপন্যাসের ধীবরদের জীবন ও জীবিকা পরিচালিত করেছে। বিপুল পদ্মা যখন কৃপণ হয় তখন মাঝিদের জীবনে দূর্দশা নেমে আসে, আবার ইলিশের মরশুমে তাদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি অথবা জীবিকা অর্জনের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। আর্থাৎ পদ্মা নদী এই উপন্যাসের চরিত্র, কাহিনি ও গতিকে সক্রিয় ভাবে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে ইছামতী নদী সক্রিয়ভাবে এই উপন্যাসের কাহিনির গতি বা কোন চরিত্রকে প্রভাবিত বা পরিবর্তন করেনি। ইছামতীতে সাঁতারের দৃশ্য, মুক্ত পাওয়ার ঘটনা মাঝে মাঝে বিশেষ কোন পাত্রপাত্রীর জীবনে বা গ্রামের মানুষের জীবনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও তা দুদিন পরে স্তিমিত হয়ে গেছে, স্থায়ী কোন স্বাক্ষর রাখেনি।[৬] পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কুবেরের জীবন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পদ্মার কৃপণতা ও উদ্দামতা একটা বড় ভূমিকা পালন করলেও ইছামতী'তে সবচেয়ে পরিবর্তনশীল চরিত্র নালু পালের জীবনের সঙ্গে ইছামতীর কোন সম্পর্ক নেই।যদিও নালু পালের এই পরিবর্তন মূলত অবস্থার পরিবর্তন, চারিত্রিক নয়। অর্থাৎ ইছামতী উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে ইছামতী নদীর তেমন কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে ধীবর মাঝিদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, নিষিদ্ধ প্রেম, দহনজ্বালা সবই পদ্মা নদীর প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইছামতী উপন্যাসে ইছামতী নদী কেবল একটি গতিশীল প্রাণের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কখনো তা আমাদের জাতির সামাজিক চূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী, আবার কখনো একটা নিরন্তর কালপ্রবাহের প্রতীক রূপে প্রতিভাসিত হয়েছে।

ইছামতী উপন্যাসে একদিকে যেমন হত দরিদ্র মানুষের ছবি আছে, তেমনি পর্ণকুঠিরে বসবাসকারী দেবোপম মানুষের কথাও আছে, যেখানে উচ্চ আদর্শবাদের কথা স্পষ্ট। যেমন, ভবানী বাঁড়ুয্যের মত সাধারণ মানুষ উচ্চ আদর্শবাদের জন্য দেবোপম চরিত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে হত দরিদ্র মানুষের কথা থাকলেও উচ্চ আদর্শবাদ বা দেবোপম মানুষের কথা নেই। এখানে হোসেন মিয়া পরোপকারী কিন্তু দেবোপম চরিত্রে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কারণ তার সব উপকারের মধ্যে একটা স্বার্থ আছে।এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা মন্তব্য তুলেধরা যায়। তার মতে "উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণ রূপে নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিত বোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা নির্দেশ। এই ধীবর পল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত অভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়ামাত্র হয় নাই। এই শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি মেজবাবুর কথা মাঝে শোনা গেলেও , তিনি কিন্তু বরাবরই যবনিকার অন্তরালে"।[৭]

ইছামতী'তে নদীর দুপাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা বারবার থাকলেও পদ্মানদীর মাঝি'তে তা আনুপুঙ্খিত। কারণ পদ্মানদীর মাঝি'র কাহিনির প্রেক্ষাপটে রয়েছে ধীবরদের দুর্বিষহ জীবনের ধারাবাহিক ঘটনা। যেখানে লেখকের প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য বর্ণনার কোন অবকাশ ছিল না। তবে এই প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা থাকলে তা অতি রোমাণ্টিকতার দোষে দুষ্ট হত; গল্পের বাস্তবতা রোমাণ্টিকতায় ধামা চাপা পড়ে যেত।

পদ্মাপাড়ের জেলেদের আভাববোধ ইছামতী উপন্যাসের মত নয়। পদ্মানদীর মাঝি'র চরিত্ররা তাদের আভাববোধ থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেনি। এখানে মাঝিরা তাদের বৃত্তিগত পরিচয় ছেড়ে ময়নাদ্বীপের রহস্যময় জগতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে। ইছামতী'র ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। এখানে নীলকর সাহেবদের পতনের ফলে প্রজারা নীল চাষ করা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রগুলির মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

ইছামতী উপন্যাসের মৃত্যুচেতনা পদ্মানদীর মত তীব্র নয়। পদ্মানদীর মাঝি'তে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ যেন এক অদৃশ্য নিয়তির মত বেশ কয়েকটি চরিত্রের সর্বনাশা ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছে। এই দ্বীপ মায়াবী, রহস্যময় -- জীবন না মৃত্যু তা কেউ জানে না। তবে ইছামতী'তে ভবানী, তিলু ও নিস্তারিণীর কামট-কুমিরের ভয়কে উপেক্ষা করে জলে সাঁতার কাটার মধ্যে কোন মৃত্যুচেতনার ছাপ ধরা পড়ে না।

আলোচ্য দুটি উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় পদ্মানদীর মাঝি'তে নায়ক হল কুবের, কিন্তু ভবানী ইছামতী'তে নায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ তার সক্রিয়তা উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যান্য চরিত্রের বিচিত্র হৃদয়দ্বন্দ্বের গ্রন্থি উন্মোচন করে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনির অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারেনি। আবার অবৈধ প্রেমের ক্ষেত্রে কপিলা ও নিস্তারিণীকে পাশাপাশি দাঁড় করানো যায় না। কারণ বিভূতিভূষণ দেহগত প্রেমকে আত্মিক প্রেম রূপে দেখতে চেয়েছেন। সেই কারণে নিস্তারিণীর অবৈধ প্রেমের মধ্যে কোন ফ্রয়েডিয় যৌন চেতনা নেই। তার এই অবৈধ প্রেম এসেছে স্বামীর ভাল না বাসা ও শ্বশুর বাড়িতে অমর্যাদার কারণ থেকে। অন্যদিকে কপিলার অবৈধ প্রেমের মধ্যে রয়েছে কুবেরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও আসক্তি। কুবেরের মধ্যেও এই আদিম প্রবৃত্তির উদ্দাদনা লক্ষ্য করা যায়। আসলে কপিলার যৌবনদীপ্ত শরীর দেখে কুবেরের মনে ভেসে উঠেছে পদ্মার উদ্বেল রূপ [৮] ---"দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার, বর্ষার পদ্মার মত"।

ইছামতী উপন্যাসে লেখক নদীর যে রূপচিত্র এঁকেছেন তা পদ্মানদীর মাঝি থেকে অনেক বেশি বর্ণনামূলক। কারণ ইছামতীর ধারেই তিনি বড় হয়েছেন এবং জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন। ফলে তিনি ইছামতীর রূপ ও সৌন্দর্য যেভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে আনেক বেশি। তবে পদ্মানদীর মাঝি'তে কাহিনি যততা নিটোল, সুসামঞ্জস্য ইছামতী'তে ততটা নয়, বরং কিছুটা এলোমেলো।ইছামতীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার আতিশয্য মূল কাহিনিকে বহু স্থানে থমকে দিয়েছে।

কালচেতনার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ইছামতী উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ, চরিত্র অতীত থেকে সমকালের গণ্ডি পেরিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে পদ্মানদীর মাঝি সমকালের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বরং আরো অতীতের দিকে পিছিয়ে গেছে। ইছামতী উপন্যাসে নিস্তারিণী এক বিদ্রোহী নারী। সে প্রচলিত সামাজ ব্যবস্থার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন যুগের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। একই রকম ভাবে ভবানী সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে নারীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলেছে—"এ সব বদলে যাবে তিলু, থাকবে না, সেদিন আসছে। ঐ খোকন যদি বাঁচে, ওর বৌকে নিয়ে ও পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবে এ গাঁয়ের পথে---কেউ কিছু মনে করবে না''। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে এমন সংস্কারমুক্ত চরিত্র চোখে পড়েনা। কপিলা তার ঘর ছেড়ে কুবেরের সঙ্গে যাত্রা করেছে শুধুমাত্র আদিম প্রবৃত্তি ও তীব্র আকর্ষণের টানে, তা কখনোই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কারের গণ্ডি অতিক্রান্ত করতে পারেনি।

সবশেষে এই দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায়—দুটি উপন্যাসই বাংলার নদী পাড়ের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে বহন করে চলেছে। বাংলার বিশেষ দুটি অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পরিচয় এই উপন্যাস দুটিতে ফুটে উঠেছে এবং এখানে নদীর প্রবাহমানতার সঙ্গে মানুষের জীবন ধারা ও সামাজিক পরিবর্তন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এই কারণে নদী হয়ে উঠেছে সাহিত্য সৃষ্টির রসদ।

তথ্যসূত্র :

১. Stein, Jess (ed). 1966. The Random House Dictionary of English Language. New York: Random House, p.-299.
২. রায়, তপন। ২০১০। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানে তুলনামূলক পদ্ধতি। কলকাতা : অঞ্জলি পাবলিশার্স, পৃ-৭৮।
৩. কুমার, মদনমোহন। ২০০৫। বিভূতিভূষণের ইছামতী। কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ-৮৭।
৪. আচার্য্য, দেবেশ কুমার। ২০১২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, পৃ-৬০৯।
৫. তদেব, পৃ-৫৮৯।
৬. পূর্বোক্ত ৩ নং তথ্যসূত্র, পৃ-৩৭।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। ১৯৮৮। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ-৫১৬।
৮. রায় চৌধুরী, গোপীকানাথ। ২০০৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি। কলকাতা :দেজ পাবলিশিং, পৃ-৮৪।

*****